PAPER CUTTING

WBCS BENGALI COMPULSORY

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

সম্পাদক সমীপেষু:

02/07/2022

জমা জল

বঙ্গে বর্ষা এসে গিয়েছে। এখানে-ওখানে আবার জল জমবে। মশার বংশবৃদ্ধিতে সুবিধে হবে। জনগণের আতঙ্ক বাড়বে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি নিয়ে। বর্ষার কথা বাদ দিলেও দু'-দশকের বেশি সময় ধরে দেখছি, রাজপুর-সোনারপুর পুর এলাকার ৩৩ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের খোলা নর্দমায় জঞ্জাল জমে জল বেরোতে পারে না। কোথাও কোথাও গৃহনির্মাণের পরিত্যক্ত ইটের টুকরো, প্লাস্টিক ও জঞ্জাল ড্রেনেই জমাট বেঁধে জল আটকায়। জল বেরিয়েই বা যাবে কোথায়। চতুর্দিকে ঘরবাড়ি হচ্ছে, ছোটখাটো ডোবা ভরিয়ে বাস্তুর সঙ্গে জুড়ে গৃহস্থজন কাজে লাগাচ্ছেন বা চাষাবাদ করছেন। ফলে, এলাকার জলধারণের জায়গাও অপ্রতুল হয়ে উঠছে। আর দেরি না করে নিকাশিনালার মাস্টারপ্ল্যান করে এখনই কাজ না এগোলে ভবিষ্যতে দুর্দশা বাড়বে এলাকাবাসীর।

দু'টি ওয়ার্ডের কিছু কিছু অংশে পাকা ড্রেন হলেও বেশির ভাগই কাঁচা অবস্থায় রয়েছে। জমা জলে মশার উপদ্রব বাড়ছে। পুরসভা থেকে মশা মারার তরল স্প্রে করলেও তার মেয়াদ ক'দিন। ব্যবহার করা জল তো সব সময় জমছে। পুর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, খোলা নর্দমাগুলোর মাটি সরানো উচিত, যাতে সেগুলিতে জল এক জায়গায় জমে না থাকে। কলকাতার জন্য বর্ষার

আগে ডেঙ্গিদমন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মহানাগরিক। শহরতলির পুরসভা কর্তৃপক্ষও সমান তালে কাজে হাত লাগালে জনসাধারণের উপকার হবে।

সৌম্যেন্দ্র নাথ জানা, কলকাতা-১৫৪

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

সম্পাদক সমীপেষু: শিল্পীর সঙ্কট

সামাজিক ন্যায়-নীতির বোধে বিচ্যুতি ঘটতে থাকলে রুচিবোধও অধঃপতিত হতে বাধ্য।

০৩ জুলাই ২০২২ ০৪:০৭

কোনও নবীন প্রতিভা যদি সঙ্গীতকে জীবিকা করেন, তা হলে বহু ক্ষেত্রে তাঁকে সামাজিক, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা, তথা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হয়। সমাজ তাঁকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সামান্য সুযোগটুকু দেয় না। অবহেলায় অনেক প্রতিভা অকালে ঝরে যায়। যদি সেই প্রতিকূলতা ঠেলে কোনও শিল্পী দাঁড়িয়ে যান, তখন তাঁর পাশে প্রচুর অবাঞ্ছিত লোক জুটে যায়, যাদের বেশির ভাগই মধ্যস্বত্বভোগী ও স্বার্থান্বেষী। তাদের কাছে সেই শিল্পী তখন সোনার ডিম-পাড়া হাঁস ছাড়া আর কিছু নয়। বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রতিষ্ঠান তখন তাঁর কাছে ভিড় করে আসে বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে বসন্তের কোকিলের মতো। কারণ, সেই শিল্পী তত দিনে এক পণ্য হয়ে উঠেছেন। তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা তৈরির পিছনে কায়েমি স্বার্থও কাজ করে। সেই লেনদেনের কারবারেও অনেকের বখরা রয়েছে। অবহেলা এবং উন্মাদনা, দুয়ের টানাপড়েনে শিল্পী বিধ্বস্ত হন, শিল্পেরও ক্ষতি হয়।

শিল্পের মান কিংবা উৎকর্ষের কথা নাহয় ছেড়ে দেওয়া হল। কারণ, গণ-চাহিদার চাপে তখন তাঁর শিল্পের গুণমানের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেই গিয়েছে। এটাও লক্ষণীয় যে, প্রচারসর্বস্ব জনপ্রিয়তায় যশ-প্রতিষ্ঠা গায়ে মেখে অনেক মধ্যমেধা তথা নিম্নমানের শিল্পী কঠিনতর সাধনক্ষেত্র ছেড়ে নেতা-মন্ত্রী হয়ে সহজতর জীবন ও সাফল্যের পথে পা বাড়িয়েছেন, এমন উদাহরণও কম নয়।

কোনও সুস্থ সমাজের প্রথম শর্ত যদি নীতিবোধ হয়, তবে তার শেষ শর্ত হল রুচিবোধ। সামাজিক ন্যায়-নীতির বোধে বিচ্যুতি ঘটতে থাকলে রুচিবোধও অধঃপতিত হতে বাধ্য। তখন সঙ্গীত, কাব্য, চিত্র-ভাস্কর্যের মতো শিল্পের উৎকর্ষ নিরূপণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রচারের ঢক্কানিনাদই উৎকর্ষের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। দিশাহারা জনগণও সেটাই মেনে নেন। দিন আসছে, যখন প্রেক্ষাগৃহে শিল্পীর পাশাপাশি সমঝদারও বিরল হয়ে আসবে।

এক দিকে অনাদর ও অবহেলা, অন্য দিকে উন্মাদনার শিকার হয়েও যাঁরা স্বধর্মে নিয়োজিত রইলেন, তাঁরা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য, বিপন্ন প্রজাতির মতো মহার্ঘ। এই প্রসঙ্গে মান্না দে-র কণ্ঠে শোনা সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা মনে পড়ে, অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রোতাদের চাপে গানের অনুষ্ঠান করে যার কণ্ঠ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। অথবা হীরক রাজ্যের সেই বাউল, যিনি তাঁর গানে সত্যভাষণের জন্য রাজশক্তির হাতে নিপীড়িত হন। বাণিজ্য ও ধনতন্ত্রের এই তাণ্ডব অন্যত্রও চলছে। পিট সিগার-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, ‘হু কিলড নরমা জিন’

কিংবা ‘হু কিলড ডেভি মুর’-এর মতো গান। মুনাফা-সর্বস্ব সমাজ সব দায় ঝেড়ে ফেলে নিরুত্তর থেকে গিয়েছে। সেই অন্ধকার এখন আরও গভীরতর হয়েছে। কেন, উত্তর মেলেনি আজও।

রঞ্জন প্রসাদ, কলকাতা-৪০

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

সম্পাদক সমীপেষু: হাল ফিরুক গ্রন্থাগারের

গ্রন্থাগারের এমন দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, পাঠকদের অনুদানেই বর্তমানে কোনও রকমে চলছে গ্রন্থাগারটি।

০৪ জুলাই ২০২২ ০৪:৫৩

কসবা-বোসপুকুর অঞ্চলের মহাজাতি সাধারণ পাঠাগার এক সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। কোভিডের কারণে বছর দুয়েক বন্ধ থাকার পর এখন সপ্তাহে আড়াই দিনের জন্য খুললেও, তার অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। এক তলার রিডিং রুম খাঁ খাঁ করছে। খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা কিছুই নেই। দোতলার মূল গ্রন্থাগারে টিমটিমে আলোয় বসে থাকেন এক জন সরকারি মহিলা গ্রন্থাগারিক। সঙ্গে থাকেন মাত্র দু’-এক জন কর্মী, যাঁদের সরকার থেকে কোনও অনুমোদন নেই। গ্রন্থাগারের এমন দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, পাঠকদের অনুদানেই বর্তমানে কোনও রকমে চলছে গ্রন্থাগারটি। পত্রপত্রিকা কেনার বা লাইট, ফ্যান চালানোর কোনও অর্থ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না কমিটির অনুমোদনের অভাবে। এখন নাকি একটি কমিটি তৈরি করে তার তিন জন কর্তার নাম অনুমোদন করে স্থানীয় কাউন্সিলরের সুপারিশ মোতাবেক সরকারের কাছে অনুমোদন চাইতে হয়। অজানা এক কারণে কাজটি সম্ভব হয়নি। তাই গত কয়েক বছর ধরে সরকারের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায়নি।

রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগারসচিবের কাছে বিনীত অনুরোধ, প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করে অবিলম্বে এই গ্রন্থাগারের হাল ফেরানো হোক, যাতে আমাদের মতো অনেক প্রবীণ নাগরিক বইয়ের মধ্যে একটু আনন্দের সন্ধান পেতে পারেন।

মৃণাল মুখোপাধ্যায়

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

সম্পাদক সমীপেষু: অন্য ভাবনা চাই

বিদেশে বহু বছর আগে থেকেই দোকান থেকে কেনা জিনিস প্লাস্টিকের ব্যাগে না দিয়ে, ব্রাউন পেপার ব্যাগে মুড়ে দেওয়া নিয়ম।

০৫ জুলাই ২০২২ ০৫:৩৯

১ জুলাই থেকে দেশে এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক তৈরি, সরবরাহ এবং বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ‘এক বার ব্যবহারযোগ্য’ প্লাস্টিক মানে, এক বার ব্যবহারের পরেই যাকে ফেলে দেওয়া হয়। যেমন— প্লাস্টিকের কাপ, প্লেট, গ্লাস, স্ট্র-সমেত বিভিন্ন দ্রব্য। বলা হয়েছে, পরিবেশ মন্ত্রকের এই নির্দেশিকা না মানলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হবে।

এই নিষেধাজ্ঞা অনেক পূর্বেই আরোপ করা প্রয়োজন ছিল। বিদেশে বহু বছর আগে থেকেই দোকান থেকে কেনা জিনিস প্লাস্টিকের ব্যাগে না দিয়ে, ব্রাউন পেপার ব্যাগে মুড়ে দেওয়া নিয়ম। সেখানে এই নিয়ম চালু করতে এ দেশে এত সময় লাগল! শুধু বিদেশ কেন, এই দেশের অনেক রাজ্যও প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ে সদর্থক পদক্ষেপ করেছে। যেমন, বছর তিনেক আগে সিকিমে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে প্লাস্টিক নিয়ে সচেতনতা এই রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি। জিনিসপত্র কিনলে দোকান থেকেই কাগজের মোড়ক দিয়ে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। গাড়ির চালকরা পর্যটকদের নিষেধ করছেন বোতল, স্ট্র যেখানে-সেখানে না ফেলতে।

এই রাজ্যে কিন্তু এমন সচেতনতা এখনও দেখা যায় না। এর আগেও প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ক্রেতা-বিক্রেতা, কেউই প্লাস্টিক দেওয়া ও নেওয়ার বদভ্যাস ছাড়তে পারেননি। ফলে, এই বারও কত দূর তা সফল হবে, সন্দেহ আছে। তাই চাই অন্য রকম ভাবনা। আইনের পাশাপাশি যে সব দোকান নিজেদের প্লাস্টিকমুক্ত রাখতে পারবে, তাদের বিশেষ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক। যে সমস্ত বাজার প্লাস্টিক দেওয়া-নেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে পারবে, তাদের পুরসভা কর মকুব-সহ বিশেষ কিছু সুবিধা দানের কথা ভাবুক। অন্য দিকে, শপিং মলগুলোর উপরও নজরদারি চলুক, যাতে দোকানগুলো পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহারে বাধ্য হয়। বাজারের বাইরে যাতে সুলভ মূল্যে কাপড়ের ব্যাগ, থলে ইত্যাদি পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা হোক। মাস্ক পরায় অনিচ্ছুক নাগরিককে যদি নরমে-গরমে মাস্ক পরিধানে বাধ্য করা যায়, তবে প্লাস্টিকে হবে না কেন?

অনুলেখা মিত্র, বর্ধমান

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

সম্পাদকীয়

ক্ষতি ভয়ঙ্কর

শিক্ষার ক্ষতির ফল শিক্ষার্থীর জীবনের সম্ভাবনাকে সীমিত করে, তার পাশাপাশি তা প্রজন্মের গণ্ডিও অতিক্রম করে অর্থব্যবস্থার উপর বিষম প্রভাব ফেলে।

অতিমারির সব ক্ষতি সমান মাপের নয়, মনে করিয়ে দিলেন অর্থনীতিবিদ জঁ দ্রেজ়। অর্থব্যবস্থার যে ক্ষতি হয়েছিল, তা পূরণ হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষতিও কাল না হোক পরশুর পরের দিন বহুলাংশে পুষিয়ে যাবে। কিন্তু, শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্ষতি হল, দ্রেজ়ের মতে, তা পূরণ হতে লেগে যাবে বহু বছর। মন্তব্যটির অভিঘাত

তীব্র, অনেকের কাছেই হয়তো আকস্মিকও— কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা সম্ভব যে, ছবিটি দেখতে না পাওয়াই বরং আশ্চর্যের। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতির চরিত্র এমনই যে, তার পূর্ণ অবয়ব অপ্রশিক্ষিত চোখে ধরা পড়তে চায় না। কিছু ইঙ্গিত বিলক্ষণ মিলেছে— বিভিন্ন সরকারি ও অসরকারি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, প্রায় সব রাজ্যে সব শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা প্রাক্-অতিমারি পর্বের তুলনায় কম শিখেছে; মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতায় নিজের নামটুকুও লিখতে পারেনি অনেক ছেলেমেয়ে; এক ছাত্রীর একটি সাধারণ ইংরেজি বানান বলতে না পারা নিয়ে তোলপাড় হয়ে গিয়েছে গোটা রাজ্য। কিন্তু, এই ক্ষতিও শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক ক্ষতির তুলনায় যৎসামান্য। কারণ, শিক্ষার ক্ষতির ফল শিক্ষার্থীর জীবনের সম্ভাবনাকে সীমিত করে, এবং তার পাশাপাশি তা প্রজন্মের গণ্ডিও অতিক্রম করে; সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার উপর বিষম প্রভাব ফেলে।

অতিমারির কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় শিক্ষা প্রথমে প্রায় সম্পূর্ণত ডিজিটাল হয়েছিল; পরিস্থিতি ক্রমে ‘নতুন স্বাভাবিক’-এ পৌঁছনোর পর যে ব্যবস্থা চলছে, তাকে বলা হচ্ছে হাইব্রিড— অর্থাৎ, অনলাইন ও অফলাইনে মিলিয়েমিশিয়ে লেখাপড়া চলছে। এই ডিজিটাল বিভাজিকায় যে অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সে কথা বহু-আলোচিত। বিশেষত দরিদ্রতর, এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কাছে এই ব্যবস্থা বিষম হয়েছে— আর্থিক অসাম্য পরিণত হয়েছে শিক্ষার সুযোগের গভীর অসাম্যে। কোনও কল্যাণরাষ্ট্রের কাছে এই অসাম্য সম্পূর্ণ অসহনীয় হওয়ার কথা। বহু ছেলেমেয়ে স্কুলছুট হয়ে গিয়েছে। স্কুলের শিক্ষাটুকু সম্পূর্ণ করলেও তাদের সামনে যে সুযোগগুলি থাকত, স্বভাবতই সেগুলি এই ছেলেমেয়েদের হাতছাড়া হবে। ফলে, তাদের আজীবন অর্থোপার্জনের, সামাজিক চলমানতার সম্ভাবনা কমবে। তার ফল পড়বে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উপর। ফলে, তাদেরও উন্নয়ন ও সামাজিক চলমানতার সম্ভাবনা সীমিত হবে। আন্তঃপ্রজন্ম ক্ষতির আর একটি পথ হল, এই ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ নিয়েই যাঁরা ভবিষ্যতে শিক্ষক হবেন, তাঁদের শিক্ষকতার গুণগত মান খাটো হওয়ার আশঙ্কা থাকে, এবং তা ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষতি করবে। সার্বিক ভাবে শিক্ষার ক্ষতি হলে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপরেও।

অর্থাৎ, অতিমারি ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রের যে ক্ষতি করেছে, শুধুমাত্র সময়ের হাতে ছাড়লে তা পূরণ হওয়া অসম্ভব। স্কুল-কলেজ যদি পুরনো, ‘স্বাভাবিক’ ছন্দে চলতেও থাকে, ব্যবস্থা থেকে ছিটকে যাওয়া ছেলেমেয়েদের তাতে ফিরে আসার রাস্তা বন্ধ। বস্তুত, ‘নতুন স্বাভাবিক’ হাইব্রিড ব্যবস্থা আরও অনেক ছেলেমেয়েকে ছিটকে দেবে, তেমন সম্ভাবনা প্রবল। ভারতীয় রাষ্ট্রকে দেখলে ভরসা হয় না যে, এই অবস্থা তার কাছে অসহনীয় ঠেকবে। তাই আলাদা ভাবে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। প্রথমে দরকার ক্ষতির প্রকৃত অডিট। প্রতিটি ছাত্রের ক্ষেত্রে আলাদা ভাবে দেখতে হবে যে, তার কত ক্ষতি হয়েছে, এবং কোন পথে সেই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব। ব্রিজ কোর্স, ডিজিটাল সহায়তা, বিশেষ প্রশিক্ষণ বা আর্থিক সাহায্য, যা প্রয়োজন, তা-ই দিতে হবে। অতিমারি-উত্তর পৃথিবীর চাহিদার কথা মাথায় রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজতে হবে। কিন্তু, সবার আগে স্বীকার করতে হবে যে, খুব ক্ষতি হয়ে গিয়েছে।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

সম্পাদকীয়

সূচনা হল কি

পরিসংখ্যান বলছে, গোটা বিশ্বে এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম একশোর মধ্যে।

সম্পূর্ণ প্লাস্টিক-মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন পূরণ হয়তো এত দ্রুত সম্ভব নয়। কিন্তু প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল ১ জুলাই। ওই দিন থেকেই গোটা দেশে ‘এক বার ব্যবহারযোগ্য’ প্লাস্টিকের বস্তুর উৎপাদন, আমদানি, মজুত, সরবরাহ, বিক্রি এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল গত বছরেই। এই বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন থেকে ১২০ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে। অর্থাৎ, প্রতি বছর যে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য এই দেশে উৎপন্ন হয়, তা হ্রাস করার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ারই পরিকল্পনা।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তে এত বিলম্ব হল কেন? বহু পূর্বেই প্রমাণিত যে, প্লাস্টিক দূষণের সঙ্গে সার্বিক ভাবে পরিবেশ দূষণের সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। ২০২১ সালের এক অস্ট্রেলীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের রিপোর্ট অনুযায়ী, গোটা পৃথিবীতে উৎপন্ন প্লাস্টিকের এক-তৃতীয়াংশই ‘এক বার ব্যবহারযোগ্য’। এর ৯৮ শতাংশই প্রস্তুত হয় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে, বায়ুদূষণ কমাতে যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করার কথা বহু-আলোচিত। অবিলম্বে যদি এই প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ না করা যায়, তবে ভবিষ্যতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের অন্যতম উৎস হয়ে উঠবে এটি। অন্য সমস্যাটি হল, এই ধরনের ব্যবহৃত প্লাস্টিক বহুলাংশে অ-সংগৃহীত থেকে যায়। রাস্তার ধারে, ফাঁকা জমিতে দিনের পর দিন জমতে থাকে পরিবেশের সঙ্গে মিশে না গিয়ে। অতঃপর তা সূক্ষ্ম কণায় মিশে গিয়ে খাবারের সঙ্গে মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে বিপদ ঘটায়। পরিসংখ্যান বলছে, গোটা বিশ্বে এক বার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম একশোর মধ্যে। সুতরাং, সতর্ক হতে যে ২০২২ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল, সেটাই বিস্ময়ের।

এবং তার পরও এই নিষেধাজ্ঞার সাফল্য নিয়েও সংশয় থেকে যায়। অভিজ্ঞতা বলে যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ঢাক পেটাতে যতটা আন্তরিক, প্রতিশ্রুতি পালনে তত নয়। প্রধানমন্ত্রী দূষণ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দেশের ভিতরেই ‘ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম’ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হয়। প্লাস্টিকের ক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কাটি অগ্রাহ্য করার মতো নয়। অবশ্য রাজ্য সরকারগুলির আন্তরিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ। গত বছর আরোপিত ৭৫ মাইক্রনের কম ঘনত্বযুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা কঠোর ভাবে পালনে এই বছরের ১ জুলাই থেকে সরকার তৎপর হয়েছে। এবং প্রথম দিনেও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যবহার চোখে পড়েছে। অথচ, রাজনৈতিক বিরোধিতা ভুলে পরিবেশ দূষণের প্রশ্নে কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্য

সরকারগুলিও সম্মিলিত উদ্যোগ করলে এত দিনে ভারত একটি সম্মানজনক স্থানে থাকত। তা হয়নি। সুতরাং, ১ জুলাই ভারতকে সার্বিক ভাবে দূষণ রোধের প্রশ্নে সত্যিই কিছুটা এগিয়ে দেবে, না কি কেন্দ্রের আরও একটি অন্তঃসারশূন্য ‘উচ্চাকাঙ্ক্ষী’ ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে, সংশয় মুছল না।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

সম্পাদকীয়

অ-নিয়ম

মাতৃত্বকালীন ছুটির আলোচনায় নজরদারির প্রসঙ্গটি অবধারিত ভাবে এসে পড়ে, কারণ গর্ভবতী কর্মীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে নতুন নয়।

আইন আছে। নেই সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ। ‘মেটারনিটি বেনিফিট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৭’ অনুযায়ী, সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি করে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্য ছুটির বিষয়ে বিস্তর টালবাহানার সম্মুখীন হতে হয় মেয়েদের। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন সম্প্রতি স্বাস্থ্য ভবন নির্দেশিকা জারি করে সরকারি সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটির আবেদন খতিয়ে দেখার জন্য ন্যূনতম তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার কথা জানিয়েছে। এই পদক্ষেপ স্বাগত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রতি এ-হেন গুরুত্ব আরোপের সুফল যেন ক্ষেত্র-নির্বিশেষে সমস্ত মেয়ে পান, শুধুমাত্র সরকারি ক্ষেত্রেই যেন তা সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবে দেখা যায়, বেসরকারি, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রের মেয়েরা এবং ঠিকাকর্মীরা প্রায়শই এই বিষয়ে বৈষম্যের শিকার হন। তাই, নজরদারি একান্ত প্রয়োজন।

মাতৃত্বকালীন ছুটির আলোচনায় নজরদারির প্রসঙ্গটি অবধারিত ভাবে এসে পড়ে, কারণ গর্ভবতী কর্মীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে নতুন নয়। এখানে গর্ভাবস্থা আজও অসুখের সঙ্গে তুলনীয়। এবং ধরেই নেওয়া হয় গর্ভবতী মহিলা ও সদ্যজননীরা আগের মতো কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাতে পারবেন না, বা সময় দিতে পারবেন না। ফলত, উৎপাদনশীলতায় বিঘ্ন ঘটবে। অন্য দিকে, মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতন হওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেই সময় অন্য কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। এই কারণগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বহু ক্ষেত্রেই মেয়েদের নিয়োগের শর্তগুলি এমন ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে ২৬ সপ্তাহের ছুটির দাবিটিই না উঠতে পারে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে, বহু প্রতিষ্ঠানে গর্ভবতী এবং সদ্যজননীদের কাজের অনুপযুক্ত পরিবেশ, শিশুসন্তানের দেখাশোনার জন্য অতিরিক্ত ছুটি না-মঞ্জুর হওয়া,

কর্মক্ষেত্র-সংলগ্ন ক্রেশের বন্দোবস্ত না থাকা— প্রভৃতি অসুবিধাগুলি। আশ্চর্য নয় যে, সন্তানের জন্মের পর ভারতের এক বড় সংখ্যক মহিলা চিরতরে কর্মজীবনে ইতি টানেন। অর্থাৎ, মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধির একটি উদ্দেশ্য— কর্মক্ষেত্রে আরও বেশি করে মহিলাদের যোগদান— অপূর্ণই থেকে যায়।

অন্য উদ্দেশ্যটি, অর্থাৎ সন্তানের যথাযথ লালনপালন করা— স্বল্প দিনের ছুটিতে সেটিও পূর্ণ হয় কি? শিশুর জন্মের পর ছয় মাস মাতৃদুগ্ধ খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বহুশ্রুত। কিন্তু যে মেয়েরা ছয় মাসের বহু পূর্বেই কর্মক্ষেত্রে যোগদানে বাধ্য হন, তাঁদের সন্তানরা সেই পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। শুধুমাত্র তা-ই নয়, শিশুর জন্মের প্রথম ছয় মাস মা-বাবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন-এর কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে পিতৃত্বকালীন ছুটিও বৃদ্ধি করার, যাতে সন্তানের বিকাশে মা-বাবা উভয়েই যৌথ ভাবে তাঁদের দায়িত্বটি পালন করতে পারেন। সেইখানে দাঁড়িয়ে মাতৃত্বকালীন ছুটির আইনটুকুও সর্বত্র যথাযথ ভাবে মানা হচ্ছে না, এই তথ্য উদ্বেগের। এই ছুটি সমস্ত মহিলা কর্মীর আইনি অধিকার। তাই এই সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখে নিয়মভঙ্গকারীদের শাস্তি বিধান আবশ্যক। প্রয়োজনে কমিটি গড়া হোক এই উদ্দেশ্যেই।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/
7JULY

সম্পাদকীয়

অরণ্যের অধিকার

অরণ্যনিবাসী জনজাতিদের কল্যাণের প্রতি মোদী সরকারের এই উদাসীনতা আকস্মিক নয়। ২০১৯ সালের দু'টি ঘটনা কেন্দ্রের মনোভাব স্পষ্ট করেছিল।

কয়েকশো শব্দের একটি বিজ্ঞপ্তি। তাতেই আদিবাসীদের হাত থেকে অরণ্যের অধিকার হৃত হওয়ার উপক্রম। সিদ্ধান্ত হয়েছে, অতঃপর তাঁদের গ্রামসভার অনুমোদন না নিয়েই 'উন্নয়নের স্বার্থে' বন ধ্বংস করতে পারবে শিল্প সংস্থা। সেই ছাড়পত্র দিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার, অরণ্যবাসীর অধিকার সুরক্ষার দায় যার উপর ন্যস্ত করেছে দেশ। অরণ্যের অধিকার আইন (২০০৬) জঙ্গলের জমি, এবং বিধিসম্মত ভাবে আহরিত অরণ্যসম্পদের অধিকার দেয় সেই সব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে, যাঁরা অরণ্যবাসী, জীবিকার জন্য অরণ্য-নির্ভর। এই আইনকে আরও পোক্ত করতে ২০০৯ সালের একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, যত ক্ষণ না অরণ্যবাসীদের অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে, অরণ্যের জমি অন্য কোনও কাজের জন্য ব্যবহার করার ছাড়পত্র কোনও কর্তৃপক্ষ দিতে পারবে না। সরকারের নয়া বিজ্ঞপ্তির ফলে অরণ্যবাসী মানুষদের মতামত নেওয়ার প্রাক্-শর্ত উঠে গেল। কেন্দ্রের ছাড়পত্র পেলেই অরণ্য ছেদন করতে পারবে শিল্প সংস্থা। সরকারের পক্ষে যুক্তি, এই 'সংস্কার'-এর ফলে অরণ্যবাসীর অধিকার সংক্রান্ত আইনবিধির প্রয়োগ আরও 'সহজ' হবে। কিন্তু কাদের কাজ সহজ হবে, কাকে বিপন্ন করবে এই আইনের শিথিলতা, সে সব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তার কারণ, নরেন্দ্র মোদী সরকারের তরফে অরণ্য-সংক্রান্ত আইন-বিধি সংস্কারের উদ্যোগ বার বারই এসেছে এক তরফা ভাবে।

সংসদে আলোচনা হয়নি, পরিবেশ ও বন বিষয়ক সংসদীয় কমিটির কাছে প্রস্তাব পেশ হয়নি, আদিবাসীদের সংগঠন বা বন সংরক্ষণের সঙ্গে সংযুক্ত নাগরিক সংগঠনগুলির বক্তব্য শোনার চেষ্টাও হয়নি।

স্বভাবতই সন্দেহ জেগেছে যে, সরকার গণতন্ত্রের নিয়ম রক্ষার তুলনায় কিছু বৃহৎ শিল্প সংস্থার স্বার্থরক্ষায় বেশি আগ্রহী। বিরোধীদের আপত্তির উত্তরে কেন্দ্র বলেছে, অরণ্যভূমিতে শিল্প প্রতিষ্ঠার ছাড়পত্র দেবে কেন্দ্র, আর অরণ্যবাসীর অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে কি না, তা দেখবে রাজ্য সরকার। দায় এড়ানোর এই চেষ্টা কত দূর নির্লজ্জ, কতখানি অপরিণামদর্শী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা কার্যত চোরকে চুরি করতে বলে নিধিরাম সর্দারকে ঘর সামলাতে বলার নামান্তর। পুলিশ-আদালতে রাজ্যের সময়-অর্থ নষ্ট হবে, আদিবাসীদের ঘরছাড়া, বেরোজগার হতে হবে।

অরণ্যনিবাসী জনজাতিদের কল্যাণের প্রতি মোদী সরকারের এই উদাসীনতা আকস্মিক নয়। ২০১৯ সালের দু'টি ঘটনা কেন্দ্রের মনোভাব স্পষ্ট করেছিল। প্রথমটি হল দশ লক্ষাধিক আদিবাসী পরিবারের উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনার সম্মুখে কেন্দ্রের নীরবতা। অরণ্যের অধিকার আইন অনুসারে, বৈধ বসবাসকারী বলে সরকারি অনুমোদন পায়নি যে সব পরিবার, তাদের উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। দেশ জুড়ে শোরগোল পড়ে, কিন্তু কেন্দ্র ছিল অবিচল। দ্বিতীয়টি হল ভারতীয় অরণ্য আইন (১৯২৭) সংশোধনে কেন্দ্রের উদ্যোগ। ওই খসড়া আইন বন দফতরের আধিকারিকদের বনের যে কোনও এলাকায় প্রবেশ, তল্লাশি, জোরপূর্বক অরণ্যবাসীদের উচ্ছেদ, এমনকি আইনভঙ্গকারীর প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়। প্রবল বিরোধিতার মুখে শেষ অবধি সরকার সংশোধনী থেকে সরে আসে, কিন্তু অরণ্যের অধিকারকে শিথিল করার চেষ্টা চলছেই। এ বছরই জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন দফতর একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলে যে, কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া এক হেক্টর পর্যন্ত অরণ্যের জমিতে আবাসন তৈরির ছাড়পত্র দেওয়া যেতে পারে। কী সেই ব্যতিক্রম, কেন বন কেটে আবাসন বানাতে আইন শিথিল করা দরকার, উত্তর মেলেনি। গণতন্ত্রের এই গভীর ঘাটতি ভারতের সমগ্র নাগরিক সমাজকে বিপন্ন করছে, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের বিপদ সর্বাধিক।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

গতি ও দুর্গতি

কলকাতার রাস্তায় গণপরিবহণের, বিশেষত বেসরকারি বাসগুলির যা দশা, তাতে রোজ দুর্ঘটনার খবর না আসাই বরং অস্বাভাবিক মনে হয়।

গতিই কি তা হলে দুর্গতির কারণ? না কি, লজ্‌ঝড়ে পুরনো বাসের অধিকতর পুরনো যন্ত্রাংশ বিগড়ে গিয়েই কাজের দিনের ব্যস্ত সকালে বেহালায় বেসরকারি বাস ধাক্কা মারল অন্য তিনটি যানবাহনকে, আবাসনের পাঁচিলে ধাক্কা মেরে ভেঙে দিল তার ফটক? পুলিশের তদন্ত ও পরীক্ষা চলছে, কিন্তু যে প্রশ্নটি কলকাতার পথে বাস ও দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বার বার উঠে আসে, এ বারও এসেছে, তার উত্তর কোথায়? আর কবে এ শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, স্বাভাবিক হবে? জুন মাসের শেষ পনেরো দিনে শহরে প্রাণঘাতী বাস দুর্ঘটনা হয়েছে চারটি, মারা গিয়েছেন পাঁচ নাগরিক। জুলাইয়ের শুরুতেই এ পি সি রোডে দু'টি বাসের গতির রেষারেষিতে দুর্ঘটনায় পাঁচ জন আহত হন, বেহালার দুর্ঘটনাতেও তারই পুনরাবৃত্তি। সৌভাগ্য যে কোনও প্রাণ চলে যায়নি, কিন্তু এ-ই কি শহরবাসীর ভবিতব্য: প্রাণ হাতে করে, ভাগ্যের হাতে জীবন ছেড়ে দিয়ে রোজ বাসে করে যাতায়াত?

কলকাতার রাস্তায় গণপরিবহণের, বিশেষত বেসরকারি বাসগুলির যা দশা, তাতে রোজ দুর্ঘটনার খবর না আসাই বরং অস্বাভাবিক মনে হয়। প্রায় প্রতিটি দুর্ঘটনার পরে জানা যায়, জড়িত বাসটির ফিটনেস সার্টিফিকেট ছিল না, স্পিডোমিটারের তার খোলা বা অকেজো, বাসচালক লাইসেন্সহীন, কিংবা ইদানীং কালের সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার: বাস চলছে 'রিসোল টায়ার'-এ, দীর্ঘ দিন ব্যবহার হতে থাকা চাকা বদলানোর পরিবর্তে অনেক কম খরচে এক ধরনের

পুরনো চাকার আস্তরণ লাগিয়ে! বাসচালক বা মালিকেরা জানাচ্ছেন যে, তাঁদের পুরনো বাস যথাযথ সংস্কারের অর্থ নেই, অনেক সময় পরিকাঠামোও মেলে না। অতিমারির বিগত দু'টি বছরে গণপরিবহণ, বিশেষত বেসরকারি বাসের পরিষেবা স্তব্ধ ছিল, পরে অবস্থা স্বাভাবিক হতে সরকারের উদ্যোগে পথে বাস নামানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাসভাড়া বৃদ্ধি বা তার স্বাভাবিকীকরণ পর্যন্ত হয়নি; বিমার টাকা মেটানো বা ফিটনেস সার্টিফিকেট করানোর খরচ মালিকেরা পাবেন কোথা থেকে? ফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে: ধুঁকতে থাকা চাকা ও যন্ত্রাংশ নিয়েই ঝুঁকির যাত্রা, এবং দুর্ঘটনা। সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে রাজ্য সরকার দায় এড়াতে পারে না। বেসরকারি বাসের সুষ্ঠু পরিবহণে প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধকতাটি আর্থিক, সরকার তা দেখবে না কেন? নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিত করতেই তো বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের সঙ্গে নিয়ম করে আলোচনা ও পদক্ষেপ জরুরি!

দ্বিতীয় যে দিকটি একই রকম জরুরি, তা হল নজরদারি। বেহালার বাসটি যে ২৭১টি 'কেস' মাথায় নিয়েও পথে ছুটছিল, তা-ই প্রমাণ: সরকার ও পুলিশের নজরদারিতে বিস্তর ফাঁক আছে। এ এক প্রকাশ্য গোপন: 'অভিজ্ঞ'জন মাত্রেই জানেন— মহানগরের রাস্তায় গতি তুলে, সিগন্যাল ভেঙে বা অন্য ভুল করেও পথপ্রহরীর হাতে 'কিছু' গুঁজে দিয়ে পার পেয়ে যাওয়া যায়, কিংবা শয়ে শয়ে কেস থাকলেও ফের দুর্বার গতিতে রাজপথে ছুটতে বাসের অসুবিধা হয় না। ভুক্তভোগী হন সাধারণ যাত্রী তথা নাগরিক, মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের মূল্যে। দুর্ঘটনার পর বাসচালকই 'ভিলেন' বনে যান, বেহালার বাসচালককেও গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের চরম আর্থিক অবহেলা, বাস মালিকদের গয়ংগচ্ছ উদাসীনতা, পুলিশি নজরদারির প্রকট গাফিলতি— এর সুরাহা কবে হবে? পরবর্তী দুর্ঘটনারও পরে?

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

এই সব সিংহেরা

ভারতীয় গণতন্ত্রের নতুন ইমারতের মাথার উপরে বিরাজমান হবে মূর্তিমান ভয়, কোনও সত্যই আর আড়ালে থাকবে না।

নতুন সংসদ ভবন তৈরি হবে, তার উপরে নতুন অশোকস্তম্ভ বসবে, সেই স্তম্ভে বিরাজ করবে নতুন সিংহেরা। এতে আর গোল হবে কি? কিন্তু গোল বেধেছে সিংহের চেহারা আর হাবভাব নিয়ে। পুরনো স্তম্ভে যাদের দেখা যায় তারা কেমন শান্তশিষ্ট, সৌম্যদর্শন, দেখলে ভক্তি হয়। নতুনদের যে রূপ প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যে উন্মোচিত হয়েছে, তাদের দেখে ভক্তি হয় কি না সে কথা তাঁর ভক্তরাই বলতে পারবেন, কিন্তু পশুরাজের স্ফীত বক্ষদেশ, সামনের দুই পায়ে প্রকট পেশির বাহার এবং মুখগহ্বরে শোভিত ধারালো দাঁতগুলি দেখে ছাপোষা মানুষ রীতিমতো ভয় পাবেন, আর শিশুরা এক বার এ-জিনিস দেখে ফেলার পরে রাতবিরেতে ভয়ে কেঁদে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ভক্তবৃন্দ সমস্বরে 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না' বলে আশ্বাস দিলেও সেই সম্ভাবনা দূর হবে বলে ভরসা হয় না। এই অপরূপ সিংহমূর্তির উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠপোষকরা অবশ্য অভয় দিয়েছেন— ওরা অনেক উপরে থাকবে, নীচ থেকে তাদের উত্তাল পেশি এবং করাল দংষ্ট্রা আমজনতার চোখে ভাল করে ধরা পড়বে না। হবেও বা। তবে কিনা, দিনকাল যা পড়েছে, পত্রপত্রিকায় এবং টেলিভিশন বা মোবাইলের পর্দায় উৎকট মূর্তিগুলির লক্ষ লক্ষ 'ক্লোজ় আপ'-এর অবিরত প্রচারতরঙ্গ রুধিবে কে? তাই, মহামান্য নরেন্দ্র মোদীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে সবিনয় নিবেদন জানিয়ে বলতেই হয়: কিছু ভয় রহিয়া গেল।

সে-কথা শুনে অবশ্য মান্যবরেরা কিছুমাত্র বিচলিত হবেন বলে মনে হয় না, বরং মনে মনে বলবেন, সংসদ ভবনের নবকলেবর এতদ্দ্বারা ষোলো আনা সার্থক হতে চলেছে। ভয় দেখিয়ে শাসন করার যে প্রকল্প তাঁরা প্রায় এক দশক ধরে একাগ্র নিষ্ঠায় রূপায়ণ করে চলেছেন, রাষ্ট্রের পরম প্রতীকেও অতঃপর সেটি নিরাবরণ হয়ে উঠবে, ভারতীয় গণতন্ত্রের নতুন ইমারতের মাথার উপরে বিরাজমান হবে মূর্তিমান ভয়, কোনও সত্যই আর আড়ালে থাকবে না। রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতার,

তথা স্বচ্ছ ভারতের, এর চেয়ে ভাল পরিচয় আর কী হতে পারে? দূর থেকে দেখলে মূর্তিগুলিকে হিংস্র মনে হবে না— এই অভয়বাণীর গূঢ় অর্থটিও কি প্রণিধানযোগ্য নয়? যে রাষ্ট্রযন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং গলা ফুলিয়ে চোখ পাকিয়ে 'আগামী পঞ্চাশ বছর' প্রতিষ্ঠিত থাকবার বার্তা দিচ্ছে, তাকে দূর থেকে দেখলে গণতন্ত্র বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কাছে গিয়ে ঠাহর করলে ছবিটা পাল্টে যায়, তার চোখে চোখ রেখে সামান্যতম প্রশ্ন তুললেও মুখের পেশিগুলি নিমেষে কুলিশকঠিন, দৃষ্টিতে নেমে আসে ভয়াল শীতলতা। ভয় রাষ্ট্রের পুরনো অস্ত্র; ক্ষমতা কায়েম রাখতে ভয় দেখানোর রীতি বর্জন করে চলতে পেরেছে এমন রাষ্ট্র আজও জন্মায়নি, স্বাধীন ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়; কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতের বর্তমান জমানাটি যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁদের বৈশিষ্ট্য এখানেই যে সেই অস্ত্রের নিরন্তর এবং যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে এখন আর রাখঢাক নেই। সিংহমশাই এখন দৃশ্যত ভয়ানক। তার মুখচোখ এবং অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে পড়ে যায় দ্য লায়ন কিং ছবির রাজভ্রাতা 'স্কার'-এর কথা, ভাই মুফাসাকে ধ্বংস করে যে রাজা হয়েছিল।

মুফাসার সন্তান শেষ অবধি রাজ্যপাট ফিরে পেয়েছিল, আরণ্যক প্রজারা স্বস্তি ফিরে পেয়েছিল রাজা সিম্বার দক্ষিণমূর্তি দেখে। সিনেমায় যা হয়, বাস্তবে তা হবে কি? গণতন্ত্রের ইতিহাস জানিয়ে দেয়— এবং ভরসা দেয়— এই প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করবেন দেশের নাগরিকরাই। সেই উত্তর ইতিবাচক হবে কি না, ভরসা সার্থক হবে কি না, সে-কথা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বস্তুত, এই মুহূর্তে ভারত নামক দেশটির হাল দেখে দুশ্চিন্তা হয়, এই নতুন সিংহবাহিনীই বুঝি তার উপযুক্ত দোসর, তাদের এই স্ফীতবক্ষ করালবদন প্রতিমাগুলিই দেশবাসীর একটা বড় অংশের পছন্দসই, কারণ তাঁরা শাসকদের ভয় পেতেই চান। ভয়ই যদি রাজভক্তির প্রধান উপকরণ হয়ে ওঠে, তবে ভয়ের শাসন জারি রাখা সহজ হয় বটে। মাকিয়াভেলি কত কাল আগেই রাজপুত্রের কানে কানে বলে গিয়েছেন: প্রীতি অপেক্ষা ভীতি বেশি নিরাপদ, এটা যেন ভুলো না বাপু। অতএব, ভয় হয়, এখন থেকে হয়তো বাতাসে মাঝে মাঝে ভেসে আসবে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্মৃতিমেদুর বেদনাবিধুর আর্তি: আর কি কখনও কবে অশোকস্তম্ভে সৌম্য শান্ত ভদ্র সিংহেরা ফিরে আসবে? এবং তা শুনে নতুন সংসদ ভবনের মাথায় বসে নয়া মূর্তিরা উত্তর দেবে: যে ধাতু থেকে হিংসা-র উৎপত্তি, সিংহ-ও সেই একই ধাতুতে গড়া, এই সামান্য ব্যাকরণটুকুও জানো না?

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

নেই-রাজ্য

জোড়াতালি ব্যবস্থার মাধ্যমে চলছে অগণিত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠনের কাজ। অথচ, জেলাগুলির প্রচুর শিক্ষার্থী এই স্কুলগুলির উপরেই মূলত নির্ভরশীল।পশ্চিমবঙ্গে স্কুলে শিক্ষক-নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা হয়, স্কুলে শিক্ষকের ঘাটতি শিক্ষাব্যবস্থার কতখানি ক্ষতি করছে, সে বিষয়ে আলোচনার পরিমাণ তার কণামাত্রও নয়। রাজনীতির কাছে চাকরির গুরুত্ব অনেক, শিক্ষা সে তুলনায় নিতান্তই এলেবেলে। মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জে সাকার ঘাট জুনিয়র হাই স্কুলের খবর মিলেছে— সেখানে উচ্চ প্রাথমিকে ৭৭২ জন পড়ুয়া-পিছু শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১। এবং স্কুলটি ব্যতিক্রম নয়। অন্যত্র ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের ছবিটা সর্বদা এমন ভয়াবহ না হলেও, বহু উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে মাত্র এক বা দু'জন শিক্ষকের উপরেই পঠনপাঠনের দায়িত্বটি ন্যস্ত। কখনও সেই শিক্ষক ছুটিতে গেলে স্কুলের গ্রুপ-ডি কর্মীকে ক্লাস নিতে হয়, কখনও আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করে আপৎকালীন সমাধানের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, স্কুলে লেখাপড়া হবে

না, এই কথাটি ক্রমেই এত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে, এমন ভয়ঙ্কর অবস্থাও সচরাচর আলোচনা বা আন্দোলনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

জোড়াতালি ব্যবস্থার মাধ্যমে চলছে অগণিত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠনের কাজ। অথচ, জেলাগুলির প্রচুর শিক্ষার্থী এই স্কুলগুলির উপরেই মূলত নির্ভরশীল। শিক্ষকসংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে তাদের পঠনপাঠনে যে ক্ষতি হচ্ছে, তা অপূরণীয়। এই অবস্থা শিক্ষার অধিকার আইনের পরিপন্থী। এই আইনের বলে শিক্ষার অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কিন্তু শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে যদি ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের ক্ষেত্রে এমন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, যার জন্য দৈনন্দিন পঠনপাঠনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে শিক্ষার অধিকারটি অটুট থাকে কি? এক জন শিক্ষার্থীর জীবনে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষাকে ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। সেই ভিত্তিই যদি এমন দুর্বল থাকে, তা হলে তার আগামী জীবন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হবে কী উপায়ে? প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার পিছনে বার বারই আইনি জটের কথা বলা হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ২০২১ সালের টেট লিখিত পরীক্ষায় পাশ করা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও মামলা দায়ের হয়নি। অথচ, সেই প্রক্রিয়া ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও শুরু হয়নি। ইন্টারভিউ কবে হবে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তারও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ বা শিক্ষক নিয়োগের মতো বিষয়গুলি একেবারে প্রাথমিক কর্তব্য। কোনও সরকার যদি সেই প্রাথমিক বিষয়গুলিতেই উদাসীন থাকে, তবে শিক্ষার প্রসারে তার সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তেমনই। কোথাও পর্যাপ্ত স্কুলঘর নেই, শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে একটিমাত্র ঘরে, নয়তো খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে বাধ্য হয়; কোথাও শিক্ষক নেই, অথবা শিক্ষক থাকলেও পড়ুয়া নেই; কোথাও শৌচালয়-পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই— আশ্চর্য নয়, সচেতন অভিভাবকরা কিছু অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে বেসরকারি স্কুল, অথবা গৃহশিক্ষকতার শরণাপন্ন হচ্ছেন। অবিলম্বে সরকার এবং সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ ফেরানো দরকার। নয়তো বৈষম্য আরও চওড়া হবে। এমনিতেই অতিমারির কারণে শিক্ষার বিপুল ক্ষতি হয়েছে। মৌলিক কর্তব্যগুলিতে গাফিলতি করে সেই ক্ষতির পরিমাণ না বাড়ানোই মঙ্গল।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

মাতৃমৃত্যু

প্রসূতি-মৃত্যুর হার দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক তো বটেই, তা সার্বিক উন্নয়নেরও তাৎপর্যপূর্ণ মাপকাঠি।

লক্ষ্যপূরণের চেয়ে ঢের দূরে দাঁড়িয়ে ভারত। লক্ষ্য, প্রসূতি-মৃত্যুর হার বা এমএমআর রাষ্ট্রপুঞ্জ নির্ধারিত সূচকে নামিয়ে আনা। প্রতি এক লক্ষ প্রসবপিছু যত জন প্রসূতির মৃত্যু ঘটে থাকে গর্ভাবস্থা বা প্রসবকালীন নানাবিধ জটিলতার কারণে, সেই অনুপাতকে বলে প্রসূতি-মৃত্যুর হার। এই হার কমানো একান্ত জরুরি। সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রপুঞ্জের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-র অধীনে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার ধার্য করা হয়েছিল ৭০। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় প্রকাশ, ভারতে এই মুহূর্তে এমএমআর ১১৩। ২০১৭-১৯ সালের মধ্যে ‘হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম’-এ নথিভুক্ত করা প্রায় ৬ কোটি ২০ লক্ষ প্রসব এবং প্রায় ৬১ হাজার মাতৃমৃত্যুর ঘটনা বিশ্লেষণ করে মিলেছে এই পরিসংখ্যান। ভারতের প্রায় ৭০ শতাংশ জেলাতেই এই হার রাষ্ট্রপুঞ্জ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। এবং সমগ্র বিশ্বে যত প্রসূতি মৃত্যু ঘটে, তার ১৫ শতাংশই ভারতে। এ ক্ষেত্রে ভারতের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়, আগে শুধুমাত্র নাইজিরিয়া।

প্রসূতি-মৃত্যুর হার দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক তো বটেই, তা সার্বিক উন্নয়নেরও তাৎপর্যপূর্ণ মাপকাঠি। এই সূচকে খারাপ ফলের অর্থ, সামগ্রিক ভাবে দেশটিতে অপুষ্টি, নাবালিকা বিবাহ, সচেতনতার অভাব ইত্যাদি সমস্যাগুলি বহাল তবিয়তে থেকে গিয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হবে প্রাথমিক স্তরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে পরবর্তী স্তরের এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান, যার কারণে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে যথাযোগ্য চিকিৎসা পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। বিশেষত জেলা হাসপাতালের রেফার-রোগ অনেকাংশে প্রসূতি-মৃত্যুর জন্য দায়ী। আবার অনেক ক্ষেত্রে অ-নিরাপদ গর্ভপাতকেও এর জন্য দায়ী করা চলে। পঞ্জাবে যে হঠাৎ প্রসবকালীন মৃত্যুর হার ঊর্ধ্বগামী হয়েছে, সে ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত কারণটিই দায়ী বলে অনুমান। প্রসঙ্গত, দেশের প্রসূতিদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের নীতিনির্ধারকরা এমএমআর-কেই মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। সেখানে ভারতের মতো দেশের সত্তর শতাংশ জেলাই বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেকটাই পিছনে পড়ে আছে, এমন তথ্য উদ্বেগজনক বইকি।

তবে এমন নয় যে, ভারতে প্রতি বছর প্রসূতি-মৃত্যুর হার হ্রাস পাচ্ছে না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যে গতিতে প্রসূতি-মৃত্যু হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল, ভারত সেই লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে পারেনি। এসডিজি-নির্ধারিত বাৎসরিক প্রসবকালীন মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৫ শতাংশ। ভারতে সেই হার ৪.৫ শতাংশেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, প্রসূতি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অবনমনের চিহ্নটি দীর্ঘ কাল ধরেই স্পষ্ট হচ্ছিল। নিঃসন্দেহে অতিমারির আগমন পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়াতে এবং প্রসবকালীন সমস্যা এড়াতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসূতিদের স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখেন আশাকর্মীরা। কিন্তু কোভিড-যুদ্ধে তাঁদেরও নিযুক্ত করায় প্রসূতি এবং শিশুস্বাস্থ্যের দিকটি সবিশেষ অবহেলিত হয়েছে। এর প্রভাবও আগামী দিনে প্রসবকালীন মৃত্যুর হারে পড়তে চলেছে। সুতরাং, এই অ-গৌরব থেকে ভারত দ্রুত মুক্তি পাবে, তেমন আশা ক্ষীণ।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

সম্পাদক সমীপেষু: সুরক্ষার উপায়

বড় বড় সংস্থা থেকে শুরু করে ছোট ছোট কুটিরশিল্প, বা ইটভাটাতে কাজ করতে আসা মহিলা শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।নীরবে হয়রানি সহ্য করাই মেয়েদের কাজ করার শর্ত, এই ছবিটি স্বাতী ভট্টাচার্য এক চটকল মহিলা শ্রমিকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন (‘ফাইট করে টিকে আছি’, ২৭-৬), যা প্রতীকী মাত্র। যে কোনও সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় নারী কর্মীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ধারা চিরবহমান। বড় বড় সংস্থা থেকে শুরু করে ছোট ছোট কুটিরশিল্প, বা ইটভাটাতে কাজ করতে আসা মহিলা শ্রমিকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা থেকে শুরু করে মস্তান ও তোলাবাজ পুরুষ— কাজের প্রয়োজনের জন্য মেয়েরা সবার শিকার হন। এ যে অন্যায়, তা তাঁরা জেনেও প্রতিবাদহীন হয়ে পড়েন। কারণ, তাঁরা জানেন এ ব্যাপারে মুখ খুললে তাঁদেরই গায়ে ‘ব্যভিচারিণী’ তকমা সেঁটে যাবে, কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে, এবং সমাজের বুকে হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে। হয়তো ভিক্ষা করে সংসার চালাতে হবে। মেয়েদের সুরক্ষা দেওয়া, পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। বেসরকারি সংস্থাগুলিতে যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি রয়েছে, তার সদস্যরা কাজ হারানোর ভয়ে সর্বদাই ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই নারী শ্রমিক নিরাপত্তার ব্যাপারে আন্দোলনে তাঁরা সম্পূর্ণ পঙ্গু। ফলে, তাঁরা মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁদের সুরক্ষার জন্য আন্দোলনও করেন না।

যদি রাজ্যের মহিলা কমিশন বেসরকারি সংস্থার নারীদের কাজে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিতে সচেষ্ট হয়, তা হলে ওই নারী শ্রমিকদের কাজ টিকিয়ে রাখার জন্য চিরদিন আর ‘ফাইট’ করতে হবে না। তবে এটাও দেখতে হবে, কোনও নারী শ্রমিক যেন মহিলা কমিশন বা কমিটিকে সুরক্ষার ঢাল করে কোনও নিরপরাধ পুরুষকে ফাঁদে না ফেলেন!

তপনকুমার বিদ, বেগুনকোদর, পুরুলিয়া

সম্পাদক সমীপেষু: খণ্ডিত গৌরব

মৌর্য শাসনপর্বে সম্রাট অশোকের নির্মিত সিংহমূর্তি দ্বারা গঠিত ভাস্কর্য ‘অশোক স্তম্ভ’ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের জাতীয় প্রতীক রূপে স্বীকৃত হয়।

যে কোনও প্রাচীন ভাস্কর্য নিছক শিল্প নয়, তা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। সে সব ভাস্কর্য দেশের ইতিহাস ও জাতীয়তাবোধের ধারা বহন করে চলে। মৌর্য শাসনপর্বে সম্রাট অশোকের নির্মিত সিংহমূর্তি দ্বারা গঠিত ভাস্কর্য ‘অশোক স্তম্ভ’ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের জাতীয় প্রতীক রূপে স্বীকৃত হয়। এত বছর ধরে এই স্তম্ভ ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছে। তাই নতুন সংসদ ভবনের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হতে চলা জাতীয় প্রতীকে সিংহের মূর্তিগুলি দেখে দেশের ইতিহাস-সচেতন ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষরা হতবাক হয়ে গিয়েছেন। নতুন স্তম্ভে সিংহগুলির পেশিবহুল চেহারা ও দন্ত-বিকশিত, হিংস্র মুখ যেন নতুন ভারতের দিকনির্দেশ করছে। সম্রাট অশোকের আমলে নির্মিত অশোকস্তম্ভের সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। দেশের বর্তমান সরকার আমাদের নতুন করে ইতিহাসের পাঠ দিচ্ছে। ঐতিহ্যশালী প্রাচীন শহর, জনপদের নাম পরিবর্তন করছে, আবার মা কালী থেকে হজরত মহম্মদ-এর নতুন ব্যাখ্যা দিচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অর্থ কখনওই এটা নয় যে, ইতিহাস ও সভ্যতা নিয়ে খেয়ালখুশি মতো খেলা করা যেতে পারে। আসলে রাষ্ট্রনায়করা বোধ হয় নিজেদের সভ্যতার ধারণার ছায়ায় নতুন ভারতের ইতিহাস রচনা করতে চাইছেন। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের ভাষায়, এ হল ‘ইতিহাসের বিকৃতি’। রাষ্ট্রশক্তির ইচ্ছায় অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাস্কর্য তথা ইতিহাসের বিকৃতি দেশবাসীর কাছে কখনওই গৌরবময় নয়। বরং তা বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/